বসত

চন্দ্রা মজুমদার

ব্যাগ গুছোতে ঢের সময় লেগে যাচ্ছে। অনেকদিন বাদে আবার এ বাড়িতে আসা। বেশিদিন না এলে বড় মনখারাপ হয়ে যায়। কেন হয় ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না কাউকে—এ কথাই ভাবছিলেন মণীশবাবু। ছাদে দাঁড়িয়ে ভোরের ঠান্ডা হাওয়ার চলাফেরা করার মধ্যে দেখতে পান আম ডালের ডগায় ডগায় মুকুল, গন্ধে ভরে যাবে চারিদিক। এরপর আসবে ঝরে যাবার পালা। ঝরতে ঝরতেও থেকে যাবে কিছু আম্রশিশু। অতর্কিত ঝড়ে শিলাবৃষ্টিতে বা প্রখর তাপে আরও অনেক অকালমৃত্যু ঘটবে। ছোট্ট নিড়ানি হাতে ক্যাকটাসের টবে গজানো আগাছা সাবধানে তুলছেন মণীশবাবু। মুখে একটু হাসির আভাস দেখা দেয়— একটু অসাবধানে কন্টকগুল্মরা হুল ফুটিয়ে দেবে, সে ভীষণ কষ্টকর। চোখে দেখা যায় না অথচ খচখচ করে। চাপে চাপে আরও গভীরে ঢুকে যায়, ঠিক যেন বলতে না পারা, অন্যের চোখে না পড়া কষ্টের মতো, যা উপরে ফেলা সাধ্যের অতীত। কেমন করে যেন থেকে যায় আর মাঝে মাঝে জানান দেয়।

একটা টব পরিষ্কার হতেই আর একটা ধরেন। এর আবার গজিয়েছে কতগুলো এলা বা জাইগ্যানসিয়। ভারি আপশোশ হয় মণীশবাবুর, আরও আগেই এদের উৎখাত করার দরকার ছিল। মূল গাছটার খাদ্য খেয়ে নিয়ে এর বাড়বৃদ্ধি, ইতিমধ্যেই গাছটিকে দুর্বল করে ফেলেছে! আর একে প্রশ্রয় দেওয়া টিক নয়। চারিদিকের অভিজ্ঞতায় মণীশবাবু এখন বুঝেনিয়েছেন সময় মতো সকলের দাবি না মেটালে ক্ষতির মাত্রা বাড়তেই থাকে। আর ভুল করবেন না-মানে মনে প্রতিজ্ঞা করেন। এমন প্রতিজ্ঞা আগেও করেছেন, রাখতে পারেননি - বড় দুর্বল মানুষ উনি।

সর্ব মানুষেরই নিজস্ব কিছু সাধ আহ্লাদ থাকে, মণীশবাবুর তেমন কিছু ছিল না - উচ্চাশাতো নয়ই, এখন ও নেই। বার দশেক বিভিন্ন ভাড়াবাড়িতে বসবাসের অভিজ্ঞতা বড় তিক্তি। মরিয়া হয়েই তাঁকে মাথা গোঁজার মতো একটা ঠাঁই এর কথা ভাবতে হয়েছে। স্থায়ী একটা বন্দোবস্ত না করলে বার বার সপরিবারে বিপন্ন হতে হচ্ছে। এদিকে সঞ্চয় তো কোথাও কিছু নেই, প্রভিডেন্ট ফান্ডই একমাত্র ভরসা, সেইবা কতটুকু। তবু সেখান থেকেই সর্বোচ্চ পরিমাণ তুললে কাজ শুরু করেছিলেন। তারপর সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে লাগলো— ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু বাড়ির নকশা করে সেটা একেবারে পৌরসভায় মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে এল, সরকারি রেটে সিমেন্ট মিলিয়ে গেল, ইটভাটার মালিক। কিছু টাকা হাতে পেয়েই সমস্ত ইট সরবরাহ করল। বন্ধু দল এগিয়ে এসে কিছু কিছু টাকা ধারও দিল। ফলে ধীরে দীরে নয়—তিন মাসের মধ্যেই বাড়িটা খাড়া হয়ে গেল। গরিবের মতো হলেও ''গৃহপ্রবেশ'' অনুষ্ঠান মন্দ হল না। নতুন বাড়ি, বেশ কিছু গৃহসজ্জার বস্তু পেল উপহারস্বরূপ। মণীশবাবু ভীতু মানুষ—এমন আশ্চর্য ঘটনা এত দ্রুত ঘটাতে পারবেন বলে ভাবেননি। বাড়ি ভাড়ার টাকাটা এখন চলে যায় ঋণশোধ। ব্যবস্থা মন্দ নয়। ঋণশোধ হতেই প্রয়োজনয়ও বেড়ে গেল, দোতালাটানা করে ভারি অসুবিধা, ছেলেরা বড় হচ্ছে, ওদের পড়াশুনার জায়গা দরকার দরকার নিরিবিলি। এখন টাকা ধার দেবার জন্য অনেক ব্যাঙ্কও তৈরি। সাহসী হয়ে উঠেছেন মণীশবাবু, বিদেশি ব্যাঙ্ক দিয়ে টাকা আর পি. এফ. লোন মন্দ, পেলেন না, দোতালা হয়ে গেল। এবারে অনেক দিনের আশা স্থানাভাবে যা করতে পারেনিন মণীশবাবু, এখন আনন্দে বাগান বানিয়ে চলেছেন। বাড়ির লাগোয়া জমিতে, ছাদে ব্যালকনিতে, জানালায়, ঘরের মধ্যে—সর্বত্র বাহারি, সাধারণ, শৌখিন গাছ–ক্রোটন লতা ক্যাকটাস আর সিজনে অজস্র চন্দ্রমল্লিকা, নানা রঙিন মরশুমি ফুল।

আরও একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। লবন হ্রদ উপনগরী সৃষ্টিকালে এক টুকরো জমির জন্য মণীশবাবু আবেদন করে রেখেছিলেন। কোন জন্মের সুকৃতির ফলে এখন সেই জমির মালিকানা দিতে চায় সদাশয় সরকার। এখন বেতন হার ঢের পরিবর্ধিত হয়েছে ফলে অনেক বেশি অংকের টাকা এখন গৃহঋণ হিসাবে পাওয়া যায়। এবার যুক্তি ছেলেরা না হয় স্কুল কলেজ এখানে পড়লে কিন্তু হায়ার এডুকেশন বা চাকরি ডেলি প্যাসেঞ্জার হয়ে কি করা সম্ভব? অবশ্যই কলকাতায় একটা আস্তানা খাড়া করতে হয়। এখন আর সেদিন নেই যে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করা যাবে— সে সব হ'তো তাঁদের ছেলেবেলায়— দেখা গেল লবন হ্রদে ইটে গাঁথনি ক্রমশ উঁচু হচ্ছে।

একতলায় খানিকটা শেষ হতেই উনি এবার একটা মতলব ভাঁজলেন। পিছনের দিকটায় একটা ঘর ও বাথরুম তৈরি শেষ হতেই নিজের ব্যবহারের জন্যে রেখে সামনের দিকটায় ভাড়া বসিয়ে দিলেন। এখানে ভাড়া পাওয়া যায় অনেক বেশি। প্রথম মাসে হাতে এতগুলো টাকা পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এবার অনেক তাড়াতাড়ি ঋণশোধ হয়ে গেল—শুরু হলো দোতালার কাজ। এবার ঋণ ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে আরও বেশি। সিমেন্ট নয় মেঝেতে এবার মোজেক —ঝকঝকে ঘরদোর। বড় ছেলের চাকরি হয়েছে ভালো, থাকে মুম্বাইতে। বিয়ে স্থির হতে লময় লাগল না— কলকাতার অফিসে ট্রানসফার নেওয়ার কোন অসুবিধা নেই। অসম্ভব এক উত্তেজনা বোধ করেন মণীশবাবু। যৌথ পরিবারের মধ্যে তাঁর বিবাহিত জীবনের শুরু। সর্বদা সংকোচ আর ভয়, এই বুঝি কেউ কিছু মনে করেন। গুরুজনেরা কঠিন শিক্ষকের দৃষ্টিতে সর্বদা নজরদারি করছেন ওঁদের। স্বামী একটা স্বচ্ছন্দ হবার সুযোগ পাননি। তাঁরা এখন তার ছেলে আর বৌ থাকবে এই ঝকঝকে নতুন বাড়িতে। কী আনন্দ। বিয়ের দরুন পাওয়া নতুন জিনিস পত্র দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলা হল বাড়িটাকে। আর কিছু কেনা কাটা হ'ল, আরামের গৃহসজ্জা। বাড়িতে ফোন এল, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আর রান্নার আধুনিক সরঞ্জাম। মনীশবাবু চলেফিরে বেড়ান তাঁর স্বপ্নের ঘরবাড়ির মধ্যে।

এরপর ছেলে ভালো সুযোগ পেয়ে চলে গেল কানাডা। বাড়ি খালি। ছমাস বাদে জানালো— ''বাবা, দোতালাটাও ভাড়াদিয়ে দাও, খামোকা ফেলে রাখব কেন''? তা তো হলো, ওদের সাজানো জিনিসগুলোর কী হবে? এদেশে যখন আসবে তখন এবাড়ি ওবাড়ি ইচ্ছে মতো, প্রয়োজন মতো থাকতে পারবে কী করে? অতএব তিনতলার কাজ আরম্ভ করতে হল। অন্তত, একখানা ঘর বাথরুম করে জিনিসগুলো তুলে রাখতে হবে, সময়ে অসময়ে নিজেদেরও যাতায়াত করতে হবে। অসুখবিসুখে বড় ডাক্তার, ভালো চিকি?সা কলকাতা ছাড়া কোথায় মিলবে এবার তৈরি হচ্ছে তিনতলা—টাকা চাইলেই ভাওয়া যায়, তাছাড়া ভাড়াবাবদ টাকাটা তো আছেই, এবারের মার্বেল বসিয়ে দেওয়া হল সম্পূর্ণ মেঝেতে। ধীরে ধীরে নয়, বেশ দ্রুতই শেষ হল সব, আরও আধুনিক। ভারি সুন্দর ব্যবস্থা আগের বাড়িটা হয়েছিল ভীষণ গরিবের মতো, তখন যে কিছুই ছিল না, শুধু ছিল প্রয়োজন—নানা তরফ থেকে কিছু কিছু সাহায্য নিয়ে এমনকি স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে সোনা বন্ধক রেখে ঋণ নিয়ে কয়েকটি প্রাণীর মাথা গোঁজার জায়গাটুকু করা গিয়েছিল। আর এখন? যে কেউ দেখলেই ভাববে—বাপরে! এরা মস্ত বড়লোক।

।।দুই।।

দিন বদলায়। কখনও ভীষণ তাড়াতাড়ি আবার কখন্য শম্বুক গতিতে। এতদিন ছোট ছেলে কাছে ছিল, বর্ষীয়সী মা জীবিত ছিলেন। এখন সবকিছুই ওলটপালট হয়ে গেল। বড় ছেলেটি তো আগেই বিদেশবাসী ছোটটিরও চাকরি হল সুদূর পূর্বভারতে বেশি কিছুদিন মা রইলেন শয্যাগত, বাড়ি ভর্তি লোকজন আয়া নার্স - ডাক্তার এর চলাফেরায়, দুশ্চিন্তায় - উৎকণ্ঠায় দিন যেতে যেতে উনি গত হলেন ওঁর পারলৌকিক পর্যন্ত অনেকে রয়ে গেলেন, তারপর ফাঁকা। অবসর হয়ে গেছে, সঙ্গীসাথীর যাতায়াত প্রায় নেই।

দুখানা বাড়িতে মণীশবাবু এখন ভাগাভাগি করে থাকেন—কিছুদিন এ বাড়ি, কিছুদিন ও বাড়ি। বনধ দরজায় তালা খুলে ঢোকেন যখন কলকাতার বাড়িতে, প্রথমেই ঘাঁচ করে একটা আওয়াজ হয়। অন্যরা বলে বন্ধ থাকার দরুন কবজাগুলোতে জং ধরে থাকে বলে আওয়াজটা হয়। মণীশবাবু কিন্তু বেশ বুঝতে পারেন মেঝের ধুলোর আস্তরণ দেখে যে বাড়িটা অভিমানে ধুলিশয্যা নিয়েছে, ঢোকার সময়ে তাই বলে উঠল—এলে তাহলে? এরপর উনি ফুল ঝাড়ু নিয়ে ঝাঁটাই দিয়ে ধুলো জমা করে ফেলে দেন। বন্ধ জানালা দরজাগুলো খুলে দিতেই চমৎকার হাওয়া বইতে থাকে, ফুলছাপ পরদাগুলো তখন আনন্দে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। আর অভিমান নেই দেখে মণীশবাবু তখন কিচেনের দিকে এগিয়ে যান। গ্যাসে চা-এর জল বসান ছোট বাস্কেটটার দিকে চোখ যায়, পড়ে আছে কিছু শুকিয়ে যাওয়া সবজি। আলুগুলো থেকে নানদিকে ফ্যাঁকড়া বের হয়েছে, পেঁয়াজের মাথা থেকে চারা লম্বা হয়ে উঠেছে। এদের মাটিতে বসিয়ে দিতে পারলে ভালো ফসল হত। তার বদলে কেটেকুটে খাবার জোগাড় করতে হয়, ওদিনের মতো মন্দ নয়। পরদিন অবশ্য বাজার থেকে ডিম মাছ মাংস কিনে ফ্রিজে রেখে দেওয়া যায়। খবর পেয়ে কাজের মেয়েটি এসে ঘরদোর সাফ করলেই অভিমানীর মান ভঙ্গ হয় না—মানিপ্ল্যান্ট গুলোর পাত্রে জল বদলিয়ে পাতাগুলো ধুয়ে দিয়ে কেমন মুচকি হাসি হাসে বাড়িটা, আরও যে সব কথা সে বলতে চায় মণীশবাবু চারদিক তাকিয়েই বুঝতে পারেন। বিছানার সুজনিটা পালটাতে হবে, মেঝে পরিষ্কার হলেই কার্পেটটা বিছিয়ে দিতে হবে, ব্যাঁকাট্যারা থাকলে চলবে না, এরপর টিভিটা চালাতে হবে—তাও যেন ঠিক খুশি দেখাচ্ছে না, মণীশবাবু তখন কিচেনে গিয়ে গ্যাস জ্বালেন, এককাপ ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দিতেই বুঝতে পারেন—এবার ও খুশি হয়েছে।

সকালে খানিকটা হেঁটে নেন, তখনও বাজারটা ঠিক মতো বসে না। কিছু সবজি আর মাছ নিয়ে ফেরার পথে স্টেশনারি দোকানে ঢুকে পড়েন। কি কি ফুরিয়েছে চিন্তা করে নিয়ে কিনে নেন টুথপেস্ট আর ডিটারজেন্ট। নজর পড়ে একটা নতুন শিশি, ঘরে ছড়াবার সুগন্ধি। ওটাও নিয়ে নেন। ঘরদোর সাফ হলে পর্দাগুলো টেনে দেন। এরপর এগিক ওদিক সুগন্ধিটা স্প্রে করে টিভি চালিয়ে রিমোটটা হাতে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েন। একটা খুশি আর আরাম ছড়িয়ে পড়ে। দরকারি অদরকারি নানা তরফের ফোন আসতে থাকে। কতগুলো কাজ আবার যথেষ্ট জরুরি, বেশিদিনি ফেলে রাখা যায় না, তখন চলে আসাও জরুরি হয়ে ওঠে দরকারি কাগজ পত্র গুছিয়ে নিতে হয়। ব্যাংকের পাশবই, চেক বই, ট্যাক্সের নোটিশ, টেলিফোন, ইলেকট্রিকের বিল এরকম নান টুকিটাকি ব্যাগে ভরে ফেলেন। তারপর ফ্যান লাইট ফ্রিজ এবং গ্যাস টিভি বন্ধ করে, ঘরে ঘরে লক করে বের হবার সময় বেশ কষ্ট হয়। দরজাটা টেনে বন্ধ করার আগে একবার পিছন ফেরেন। 'চলি কেমন' কথাগুলো মনে মনে বললেও বাড়ি ঠিক বুঝতে পারে। মণীশবাবু স্পষ্ট দেখতে পান ঘরের মধ্যে কেমন ছায়াপড়ে গেছে। আসবাবপত্রও ম্লান, জলুসহীন অথচ ওর উপস্থিতিতে সব কেমন ঝকঝক করতে থাকে। আনমনে গলিপথটা পার হয়ে হাওড়ার গাড়ি ধরেন।

এবাড়ির সদরে দাঁড়ালেই কেমন একটা গাছমছমে পোড়ো বাড়ির চেহারা দেখতে পান মণীশবাবু-যেন ময়লা কাপড়ে, ধুলো মাখা শরীরে অযত্নের খোলা চুলে নিরন্ন এক পাগলিনী। ঢুকেই তাড়াতাড়ি দরজাগুলোর তালা খুলে ফেলেন, জানলাগুলো খুলতে যান। মাথায় মুখে হাতে জড়িয়ে যায় মাকড়শার জাল। নির্জন গৃহেও কী করে টিকটিকিগুলো থেকে যায়—এক একটা আকারে প্রায় কুমিরছানা, তাড়া দিলে দৌড়ে আরও কোন দুর্গম স্থানে ঢুকে যায়, কোনমতে বাড়ি ছাড়ে না। উনি বিরক্ত হয়ে ভাবেন– থাক তবে তোরাই থাক, আমাকে কি দরকার। এটা অবশ্য রাগের কথা। বাড়িটা যে তাঁর অবহেলাতেই এমন দশায় পৌঁছেছে এ কথা তাঁর মতো আর কে জানে? গভীরভাবে যে বোঝে সে কথা বলে না, কেবল তার চেহারা দিয়েই সবকিছু বুঝিয়ে দেয়, কেবল উদাসীন চোখ তাঁর চোখের দিকে তাকায় না। এর চেয়ে বোধহয় ভালো হতো যদি এক বাড়ি দরজা না খুলে ধাককা দিয়ে বের করে দিত তাঁকে। তার বদলে গুমড়ে গুমড়ে নিজেও জ্বলে ওঁকেও জ্বালায়। তবে দুতিন দিনের মধ্যেই ওর মুখ পপ্রসন্নতায় ভরে যায় আবার যেন কিছু ভাব জনাবার চেষ্টা করে। অভিমান ভুলে ধুলিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। গায়ের জামাকাপড় গুঠিয়ে মৃদু হাসে ও বুঝতে পারে মণীশবাবুর আন্তরিকতা।

সামান্য একটু ঘসামাজা তার সোহাগে, কাছপালায় একটু জলসেচন করলেই গ্রামের মেয়ের শ্রী কেমন ফুটে ওঠে। ওঁকে খুশি করার নানান পন্থা এবাড়ির জানা আছে। সকালে ছাদে উঠে মণীশবাবু হয়তো টবগুলো থেকে আগাছা তুলেছেন, দেখলেন পাশের টবের ক্যাকটাসে গোটা কয়েক কুড়ি টসটসে হয়ে উঠেছে, ফুটে উঠতে আর দেরি নেই। আগ্রহে আনন্দে অন্য টবগুলোও ছাদে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, সংগে ছোটকাট যত্ন পরিচর্যা। কিছুটা অযত্নে গাছগুলোর চেহারা খারাপ হয়েছে বটে কিন্তু প্রাণে বেঁচে আছে। এ যেন হতদরিদ্র মায়ের গুচ্ছের সন্তান। খেতে পরতে দিতে পারে না বটে তবে মাতৃস্নেহের কমতি নেই, বেচে বর্তে থাকে শেষ পর্যন্ত। দাঁড়িয়ে পড়লেন এক জায়গায়— একটি প্রায় শুকিয়ে যাওয়া লংকা গাছে পাঁচটি লংকা লাল টকটকে হয়ে আছে, সবুজ পাতার মধ্যে ওগুলো দেখতে পেয়ে মনে পড়ল ''টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল''। এ রকম লাল লংকা পেলে ওদের পোষা টিয়ার দিকে এগিয়ে দিলেই এক খানি পা নাকি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিতো, তারপর যত্ন সহকারে ঠোঁটে কুটি কুটি করে কাটতো। খাওয়ার চাইতে ছড়াতোই বেশি। মনে মনে হিসাব করেন মণীশবাবু এসব কতদিন আগের কথা? পঞ্চাশ পঞ্চান্নর কম নয়। বাপের! এরই মধ্যে এত বছর কেটে গেছে। —বোগেনভেলিয়াগুলোতে এখন পাতা নেই, লম্বা সরু ডালগুলো ফুলে ফুলে ভরে আছে। এরা জল না পেলেও দিব্যি বেঁচে থাকে, নিজের কাজ ফুল ফোটানো, তাও নিয়মিত করে যায়। আমরাই খালি অপরের দয়ার অপেক্ষায় দিন যাপন করি, অধিকাংশ আশা প্রত্যাশা তো মিথ্যেই হয়। একটা নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকেন, ফোনটা বাজছে। তাড়াতাড়ি নেমে এসে তুললেন, বিদেশ থেকে ছেলের গলা— ''বাবা! তুমি আবার এখানে চলে এসেছ! একা একা! যদি ফোন করলে সব রকম সাহায্যই পাওয়া যায়। ডঃ রায় বলেছেন বেস্ট নার্সিহোমে বেস্ট ট্রিটমেন্ট হবে। কেন যে আমাদের কথা, তোমার জন্য আমাদের টেনশানের কথা ভাবো না, জানিনা!...বল, শরীর ঠিক আছে তো!''

—''হ্যাঁ রে, খুব ভালো আছি। আজ পাঁচটা কাঁচালংকা...'' লাইনটা কেটে গেল। ফোনটা না নামিয়ে খানিকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভালো করে মানুষ করেছেন ছেলেকে। তার কর্তব্যকর্মে ত্রুটি নেই। জীবিকার্জনে বিদেশবাসী স্বাচ্ছন্দের মুক্ত জীবন ফেলে লোডশেডিং আবর্জনা আর খোলা নর্দমা ওদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দের সব ব্যবস্থাই আছে, বিশেষ করে শরীর খারাপ হলে—যেটা এ বয়সের গুরুতর প্রশ্ন। ফোনটা নামিয়ে রেখে বাইরে এসে দাঁড়ালেন মণীশবাবু? আমগাছটির কলম যখন বসান, সরু লিক্‌লিকে একটা ডাল মাত্র—নাম আম্রপালী। আজ সেটি বাড়ির অর্ধেক জুড়ে, এখন মুকুল ছেয়ে আছে, অপূর্ব গন্ধ ছড়ায় সারাবাড়ি। সেদিকে তাকিয়ে আছেন। গাছ বড় হয়েছে—প্রতি বছরে সে সময়ে মুকুল ফোটায়- তারপর কটি আম, ডাঁসা আম, পাকা আম— তিনি তার কটিই বা চোখে দেখেন— সবই অপরের জন্য। এসব করে গাছেরও তো কোন লাভ নেই, তবে সে দিয়েই চলে ব্যতিক্রমহীন। এরই নাম কি নিষ্কাম কর্ম? কে জানে! ধীরে ধীরে দিনের শেষ হল। হালকা একটা বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে—মানুষের সংসারের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েও তাদের ছোঁয়াচ ওর গায়ে লাগে না। এতক্ষণে আকাশে দেখা দেয় একটি তারা , আশেপাশে হয়তো আছে আরও অনেক, কিন্তু ও একা। লকালের ফোনটার কথা মনে পড়ে। উনি ছেলেকে বলতে চেয়েছিলেন—তোরা কেবল আমার অসুখের চিন্তা করিস, অসুখ করলে কী করতে হবে বার বার বলিস তোরা। কিন্তু আমার যে এখানে অনেক সুখ! সে সুখ থেকে সরিয়ে নিতে চাস কেন জোর করে?